অন্তরণের বিজ্ঞাপন

শুভম তালুকদার

সালটা ১৯৪৯, শরৎকাল। কালশিরা হত্যাকাণ্ড তখনও হয়নি। কিন্তু, জন্মাষ্টমির শোভাযাত্রায় আক্রমণ এনেছিল 'আনসারের দল'। এই দুই বছর ধামরাই রথযাত্রা পালন করতে দেওয়া হলো না সুকুমারদের। দুর্গা পূজাতেও যে একটা গোল বাঁধবেতা 'পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীদের' কনভয় দেখেই বোঝা যেতে লাগলো। ১৯৪৬ সালে যে গ্রামগুলিতে নোয়াখালি জেনোসাইড বা দাঙ্গা হয়েছিল, সুকুমার সেখানের বাসিন্দা। রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, রায়পুর- পরের গ্রাম লক্ষীপুর, যা টিপ্পেরহ জেলার চৌদ্দগ্রাম থানা থেকে দু-ঘণ্টার হাঁটা পথ। পুরো গ্রামটা ২,০০০ বর্গ মাইল-এর থেকে বড় নয়। 'রহমতখালী ফেরি ঘাটে' নেমে একটু এগিয়েই মজু চৌধুরী হাটে এসে সুকুমার একটি দোকানের গায়ে স্বাধীন অক্ষরে বাংলাদেশ লেখাটা দেখল। লেখাটা দেখে সে উপলব্ধি করল যে মানুষেরা নিঃশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকে আর, সে এতক্ষন নিঃশ্বাসই ফেলছিল।

লেখাটা দেখে যেমন তার গর্ববোধ হলো, স্বাভাবিক ভাবে কিছুটা কষ্ট হলো ঠিকই। সে বাংলাদেশ লেখাটা আবার দেখে এবং আরো একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে নেয়। সে মনে-মনে ভাবে 'জমি-জেলাকে তো কাঁটাতার দিয়ে ভাগ করা যায় কিন্তু, আকাশকে ভাগ করা যায় কি করে? এপার বাংলা ওপার বাংলা এক হলেও এখানকার সবুজের অন্তরঙ্গতাটা যেন একটু বেশীই।' ইংরেজ শাসকেরা এই পরিবেশ দেখেও কি করে বন্দুক-গুলি ফেলে না দিয়ে, এই দেশের মানুষদের তাদের নিজের ভাই না মনে করে এদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল সেটা ভেবে পায়না সুকুমার। মেঘের মধ্যে যেন সারাক্ষণ একটা খুনসুটি চলছে। বাতাসের মধ্যে মলিন গন্ধ যা গাছের সাথে মিশে একটি অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।

এমনই অপরূপ ছিল সুকুমারের বাল্যকালের প্রেম শিউলি। এমনি উভচরী নাম ছিল সেই মেয়ের, কিন্তু জাতেছিল সে মুসলমান। তার বাংলাদেশে আসার মূলত দুটি কারণ, থুড়ি, একটি। আমি অন্তত বলবো অনেক কটি রেখা একটি বিন্দুতে এসে অবতীর্ণ হয়েছে। বাইশ বছর পর ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে এসেছে সুকুমার। তার কাছে বাংলাদেশের স্মৃতি মানেই শিউলি, আর শিউলিকে ছেড়ে চলে যাবার কারণ হলো এই দেশভাগ।

'বাংলাদেশে চলেতো এলাম ঠিকই কিন্তু, এখন শিউলিকে খুঁজে পাবো কি করে? এখনো লক্ষীপুরের বাড়িতে গেলে কি ওদের পরিবারের কাউকে খুঁজে পাবো? কাউকে খুজে পেলে তারা কি আমাকে চিনতে পারবে? - এতগুলো আবেগপূর্ণ, পার্শ্ববর্তী প্রশ্নের পর এখনকার বস্তুত, জিনিস এর দিকে একটু বুদ্ধি ব্যয় করার চেষ্টা করে।

'কাউকে একটু জিজ্ঞেস করলে ভালো হতো যে এখান থেকে লক্ষীপুর কোথায়, আর কতটা'

একটি সবজির দোকানে একটি লোককে টমেটোর দর করতে দেখে জিজ্ঞেস করে - 'এই যে দাদা শুনছেন, এখান থেকে লক্ষীপুর... একি! নূর?'

লোকটি সুকুমারের দিকে নিরভঙ্গিমায় তাকিয়ে থাকে, অর্থাৎ অনুমান করে ও সুকুমার কে চিনতে পারেনি। একবার সে বোর্ডে মাস্টার এর লেখা মুছে নিজের নাম বড় হরফে লিখেছিলো। তার জন্যে মার ও বকাও খেতে হয়েছিল। এখন সে পার্টির দেওয়াল লেখে।

'আমাকে চিনতে পারিসনি? আমি সুকুমার, তোর বাল্যকালের বন্ধু'

নূর তার ছোটবেলাকার বন্ধু কে চিনতে পারলেও যেন মনে করলো এই জীবনে তার আবার বাংলাদেশে ফিরে আসার কোন দরকার ছিল না। কিছুটা অপ্রস্তুত ভাবে বলল 'তুই এত্তো দিন পরে এডা আসলি যে?'

সে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলেও তার মেকি আনন্দ দেখাতে অসক্ষম হয়।

‘একটা কারণ আছে, তুই এখনো লক্ষ্মীপুরে থাকিস তো? যেতে-যেতে বলছি। কিন্তু তোর মুখের একই অবস্থা? এত চাপ দাড়ি, মোটা গোঁফ, আর যুগ্ম ভুর তো ছোট থেকেই।

আচ্ছা, নবিহা মাসির বিয়ে হয়েছে? বাসুকি খুড়োর হাঁসগুলো এখনো রোজ সকালে ডিম দেয়? হরিণ বাড়ির মেয়েরা এখনো রোজ সকালে গলা সাধে?’, সুকুমার এত বছরের মনের ভিতর জমে থাকা প্রশ্নগুলো আর ধরে রাখতে পারে না। শুনলে মনে হবে সুকুমার যেন এই কালকের খবর নিচ্ছে। সে ভুলে গেছে বাইশটা বছর পেরিয়ে গিয়েছে।

‘তুই এখনো আবু তাহের মাঠে বল খেলিস? আচ্ছা, ডেঙ্গারা এখনো যোলজন মিলে ফুটবল খেলে?’ এতক্ষণে একটু চুপ করে এবং নূরের থেকে উত্তরগুলি জানতে চায়। এতগুলো প্রশ্ন একসাথে করে ফেলায় মনে মনে লজ্জিত বোধ করে সে। যেন তার আবার এও মনে হয় নূরের কাছে লজ্জা কিসের? এত বছর পর দেখা হলেও সে তো তার বন্ধুই তো। সুকুমার জানেনা সময় যেমন বদলায় সময়ের সাথে সাথে বদলায় মানুষও।

‘ইখনত আর খেলতে জাউয়া হয়না। কিন্তু তুই বৈললে এখন একটু পায়ে গোলা ছোঁয়াতে পারি। আর বাকি সব প্রশ্নের উত্তর দিমু কিন্তু আপাতত তুই আমার বাসায় চল’

রাস্তায় চলা শুরু করতে না করতেই একটা ধুলোর ঝড় ওঠে| সামনে দিয়ে কিছু উড়তি ছেলে, ভ্যানে করে মা দুর্গার মূর্তি নিয়ে চলেছে| দাদাদের পাশে হাঁটতে-হাঁটতে চলেছে কাঁসর ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে। তাদের পেছনে আরেকটি ছোট্ট ছেলে ভ্যান এর পেছনে ঘুড়ি হাতে নিয়ে দৌড়োচ্ছে, যাকে অন্যরা কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। পুজোতে হয়তো তার একটাও জামা হবে না।

কিছুক্ষণের জন্যে নাপিত কমানো বন্ধ করে দোকানের বাইরে বেরিয়ে প্রতিমাটিকে দেখে। রাস্তার চারিধারে গাছগুলি মাথা নাড়তে থাকে যেন মা দুর্গার এই ভিনদেশে আগমনী কে তারা আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ঘুড়ি হাতে ছোট্ট ছেলেটা একমাত্র সুকুমারের দিকে চায় এবং তার সামনে এসে দাড়ায়, আবার ঠাকুরের পিছনে দৌড়াতে থাকে।

সুকুমার একটি মিষ্টির দোকানে দাঁড়ায় এবং দুই বাক্স ক্ষীরমোহন কেনে। নূর বলতে থাকে 'আহা ইসবের আবার কি দরকার সিলো?'

'তোকে দেখে আমার খুব লোভ হচ্ছে। কলকাতায় থাকতে থাকতে আমার কথা বলার মধ্যে বরিশালের টানটা একেবারেই চলে গেছে। আচ্ছা এখন এখানে দুর্গা পুজো হয়?'

'ইখান থেকে ঠাকুর বানায় লিয়ে যায়। রহমান সাহেবের প্রশ্রয়ে অনেক বাড় বাড়সে ইরা'

'মুসলমানেরা পুজোতে যোগদান করে না? এখনও এই ভেদাভেদ চলে আসছে?'

'ঝগড়াণ করে যদি নবমীর দিন ভোগ খাওয়ায়। আর ঝড়ি ভেদাভেদের কথা করিস তাহলে শোন - এডা এখনো কোন মুসলিম নাপিত ভাই কোন হিন্দুর গোফ কামায় লা'

চলতে চলতে, রাস্তায়ে আরো বাল্যকালের কোথা এসে পড়লো। তার পরেই সোজা রাস্তা যেখানে ডান দিকে বাঁক নিলো, নূর বা দিকের তৃতীয় বাড়িটা দেখিয়ে বলো - ‘এডা আমগো বাসা'

নূর বাইশ বছর আগে এখানেই থাকতো কিনা সুকুমার মনে করতে পারেনা। বাড়ির সামনে কুয়াটা ভীষণ-ই বিকট দেখাচ্ছে। বাড়ির প্রধান দরজাটা দো পাল্লার। পাল্লা গুলি নতুন করে সবুজ রং করা হয়েছে।

‘কি নূর ভাই, আজকে এরশাদ সাহেব এর মিটিংয়ে যাবেন না?’ হেঁকে একটি লোক সাইকেলে করে চলে যায়। বাইশ বছর আগে সেও হয়েতো ছোট ছিল এবং সুকুমার-এর সাথে খেলেছে কখনো।

নূর আস্তে গলায় সাড়া দেয় ‘জামু’। পরক্ষণে, নূর তার বাড়ির দেরাজে কড়া নাড়ে এবং তার মেয়ের উদ্দেশে বলে ‘কৈ ঝুমুর মা, দেরাজ খান খোল '

একটি ছোট্ট, ছিপ-ছিপে, ফর্সা মেয়ে দরজা খোলে। তার চোখ, ঠোঁট এবং চোখের ওপরের ভুরুগুলি তার অনেক দিনেরই চেনা। ঝুমুর কে দেখে সুকুমারের মনে হলো সে যেন শিউলির খুব কছেই আছে। শিউলি কে খুঁজে পেতে তার আর বেশি দেরি নেই।

সুকুমার কে ভেতরের ঘরে একটি ছোট্ট টুলে বসতে দেয় নূর। সে বলে তার বউ 'গোচোর' করে এক্ষুনি আসছে। সুকুমার এক দৃষ্টিতে ঘুমুর এর দিক চেয়ে থাকে। তার মনে পরে যায় কিভাবে শিউলি তারে খেলা থমিয়া দিয়া, মোরে ওপারে হাথ ধরে নিয়ে গিয়ে খুব কেঁদেছিল আর বলেছিল 'তুমি সত্যিই চলে যাচ্ছ?' কোনো প্রতিশ্রুতি সেদিন শিউলির মনে ধরেনি। কিন্তু সুকুমার কে সে নিয়ে গিয়েছিল শিউলির পুরোনো বাগান বাড়ির ছাদে এবং সুকুমারের হাথের ওপরে নিজের হাথ রেখে ঠিক অঞ্জোলির ফুল নেবার মতন তুলে ধরেছিল আকাশে, ঠিক চন্দ্রর কুলুঙ্গি। সুকুমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে ফিরে আসবেই। দশ-কুড়ি বছর পেরিয়ে গেলেও শিউলি তো বলেছিল সে প্রতিক্ষা করে থাকবে।

নূর-এর বাড়িটা নেহাতই ছোট। নূর এর স্ত্রী তার মাথার চুল মুছতে-মুছতে ঘরে প্রবেশ করলে। সুকুমার একটি মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে দেবে বলে উঠে দাঁড়ালো। সুকুমার-এর দৃষ্টি নূরের স্ত্রীর দিকে যেতেই হিম হয়ে গেল। শিউলি এখানে? শিউলি তার মানে নূরের স্ত্রী?

'শিউলি আমাকে চিনতে পারছো না?' এই প্রশ্নটাই সুকুমারের মনে বারবার ঘুরতে থাকলো। শিউলি তারে দিকেই তাকিয়েছিল। হাত থেকে প্যাকেট খানা নিয়ে বললো -

'আপনি ওর বাল্যকালের বন্ধু শুনলাম। তা, আপনি লখিপুরে থাকতেন?', এতো বছর পরেও তার গলার স্বর একই আছে। সত্যিই শিউলি সুকুমার কে চিন্তে পারেনি।

সুকুমার কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, হয়তো সে বলতো 'মেয়েতো তোমার মতন-ই দেখতে হয়েছে' 'কিন্তু একটা শব্দও বেরোলো না। সুকুমার তৎক্ষণাৎ অন্য মিষ্টির প্যাকেটটা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েগেলো। দুটি মিষ্টির প্যাকেট যে সে একই ঘরের জন্যেই আনছে সে মিষ্টি কেনবার সময় জানতো না। তার-ই মতন প্যাকেট গুলি একটি স্থানে এসে অবতীর্ণ হয়েছে আজ।

কোন কথা বাড়াতে চায়না সুকুমার। কোনো জিনিসের স্থান বরাবরের জন্যে পরিবর্তন করতে গেলে যদি বাইরে থেকে জোর দিয়ে প্রবাহিত করতে হয় তাহলে তাকে না ছোঁয়াই উচিৎ। সে সেখানেই থাকুক। আর কোনো চলন্ত বস্তুকেও আজ থেকে থামবেনা সুকুমার। বাইশ বছর আগের সেই মধুর সন্ধ্যা আজকে যেন একটা স্বপ্ন মনে হয়। 'তাহলে শিউলি কি সেদিন অপেক্ষা করে থাকবে বলেনি? সেটাকি শুধুই কল্পনা?' গলাটা ভীষন যন্ত্রনা করছে যেন।

হটাৎ কেউ তার জামা ধরে টান মারলো, হ্যাঁ, সেই বাচ্চা ছেলেটা যে ঘুড়ি হাথে নিয়ে ঠাকুরের মুর্তির পিছনে দৌড়াচ্ছিলো। তারে হাথে শুধুই লাটাই আছে শুধু। ঘুড়ি নেই।

সে বলে - 'বাবু পুজোর সময়, কিছু দিন'

সুকুমার অন্য মিষ্টির প্যাকেটটা বাচ্চাটার হাতে দিয়ে বলে 'এটা খেয়ো'

লেখক পরিচিতি :

https://awritersbusiness.com/blog-2/2019/6/2/poetry-interview-series-arcane-zgdmd